প্রশ্ন ও উত্তরের নমুনা:

১. খাদ্য কাকে বলে? খাদ্য কত প্রকার ও কী কী বর্ণনা দাও।

উত্তর: যে সকল কঠিন ও তরল পদার্থ আহার করলে ক্ষুধা নিবারণ, দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন, কর্মশক্তি উৎপাদন, দেহের তাপ সংরক্ষণ, রোগ প্রতিরোধে ক্ষমতা বৃদ্ধি সাধিত হয় তাদের খাদ্য বলে।
খাদ্যকে মোটামুটি দুটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে- (১) প্রাপ্তিস্থান হিসেবে এবং (২) উপাদান হিসেবে।
প্রাপ্তিস্থান হিসেবে (উৎসভিত্তিক) খাদ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে- (ক) প্রাণিজ (খ) উদ্ভিদজ (গ) খনিজ।
(ক) প্রাণিজ- মানুষ প্রাণীদেহ থেকে যে খাদ্য আহরণ করে তাকে প্রাণিজ খাবার বলে। যেমন- মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ঘি, মাখন ইত্যাদি।
(খ) উদ্ভিদজ- আমাদের চারপাশে বিভিন্ন গাছপালা, উদ্ভিদ, লতাগুল্ম, শস্যখেত প্রভৃতিকে সবুজ শ্যামলিমায় ভরে রেখেছে। এ সমস্ত উদ্ভিদ প্রাণিকুল আমাদের নানা প্রকার খাদ্য সরবরাহ করে থাকে। উদ্ভিদ থেকে আহরিত খাদ্য যেমন-চাল, ডাল, আটা, তরকারি, শাকসবজি প্রভৃতিকে উদ্ভিদজ খাদ্য হিসেবে অভিহিত করা হয়।
(গ) খনিজ- খনি থেকে আহরিত খনিজ পদার্থ যেমন-ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, লৌহ, ফসফরাস ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় খাওয়া হয়।
উপাদান হিসেবে খাদ্যকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-
১। আমিষ
২। শর্করা বা শ্বেতসার
৩। স্নেহ দ্রব্য বা তেল
৪। লবণ বা খনিজ লবণ
৫। পানি
৬। খাদ্যপ্রাণ
যে খাদ্যে এই ছয়টি উপাদান পরিমাণগত বিদ্যমান থাকে তাকে পরিপূর্ণ খাদ্য বলে। কেবল দুধের মধ্যে এই ছয়টি উপাদান পাওয়া যায় বলে দুধকে পরিপূর্ণ খাদ্য বলে।

২. উপাদান হিসেবে খাদ্যকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়? বর্ণনা কর।

উত্তর: উপাদান হিসেবে খাদ্যকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-
১। আমিষ: যে খাদ্য দেহের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয় পূরণ করে, তাকে আমিষজাতীয় খাদ্য বলে। আমিষ দুই প্রকার। যথা- (১) প্রাণিজ আমিষ- মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি। (২) উদ্ভিদজ আমিষ চাল, ডাল, গম, ভুট্টা ইত্যাদি। খাদ্যের ছয়টি উপাদানের মধ্যে মানবদেহে আমিষের প্রয়োজন সর্বাধিক।
২। শর্করা বা শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য: যে খাদ্য দেহের সর্বাধিক শক্তির চাহিদা পূরণ করে তাকে শর্করা বা শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য বলে। চাল, আটা, ময়দা, আলু, গাজর, আখ, চিনি প্রভৃতি থেকে শর্করা পাওয়া যায়।
৩। স্নেহ বা চর্বিজাতীয় খাদ্য: যে খাদ্য দেহের গঠন রক্ষা, সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও কর্মশক্তি উৎপাদন করে তাকে স্নেহজাতীয় খাদ্য বলে। ঘি, মাখন, বিভিন্ন প্রকার ভোজ্য তেল, ডালডা, চিনা বাদাম, কাজু বাদাম, মাছ, মাংস, ডিম, দুধে স্নেহ জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়।

৪। লবণ বা খনিজ লবণজাতীয় খাদ্য খাদ্যের যে উপাদান দেহে রক্ত ও বিভিন্ন তরল পদার্থ গঠন ও পরিমাণগত দিক ঠিক রাখে এবং হাড় ও দাঁতের গঠনে সহায়তা করে তাকে খনিজ লবণজাতীয় খাদ্য বলে। সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ প্রভৃতি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ।

৫। পানি: পানি দেহের অপরিহার্য অংশ। দেহের প্রতিটি কোষের চারপাশে এবং কোষের অভ্যন্তরে পানি থাকে। মানুষের দেহের ৬০ থেকে ৭০ ভাগ হচ্ছে পানি। পানি দেহকোষের সজীবতা রক্ষা, তন্ত্র গঠন, রক্ত তারল্য বজায় এবং মলমূত্র ও ঘাম উৎপাদনে সাহায্য করে।

৬। খাদ্যপ্রাণ: খাদ্যের অতিরিক্ত সহায়ক শক্তিবিশিষ্ট জৈব পদার্থগুলোকে খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন বলে। খাদ্যপ্রাণ দেহকোষ, কলাসমূহের স্বাভাবিক গঠন ও বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য উপাদান। খাদ্যপ্রাণ পানিতে ও চর্বিতে দ্রবণীয় অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স (বি-১, বি-২) পাওয়া যায় দুধ, চিনি, বাদাম, সবুজ শাক সবজিতে এবং ভিটামিন সি টকজাতীয় ফল যেমন- আমড়া, আমলকী, পেয়ারা, আনারস, কাঁচা আম, জাম, লেবু টমেটো ইত্যাদিতে থাকে। চর্বিতে যে সকল ভিটামিন দ্রবীভূত থাকে তা হচ্ছে ভিটামিন এ, ডি, কে, ই।

৩. বিশ্রাম ও ঘুমের প্রয়োজনীয়তা লিখ।

উত্তর: খেলাধুলা করলে অঙ্গ সঞ্চালন হবে, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে এবং দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে সুন্দররূপে গড়ে উঠা যাবে। বিদ্যালয়ে পড়াশোনার বাইরে যখন শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে খেলাধুলা বা শরীরচর্চা করে থাকি। খেলাধুলা করার সময় নির্দিষ্ট থাকবে এবং এই সময়ের বাইরে অতিরিক্ত সময় খেলাধুলা করা যাবে না। কারণ খেলাধুলা শরীরকে ক্লান্ত করে তোলে, ফলে অবসাদ আসে। এ অবস্থায় ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করার জন্য অবশ্যই বিশ্রাম নিতে হবে এবং বিশ্রাম হবে পরিমিত। পরিমিত বিশ্রাম করলে আমাদের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হবে। হজম শক্তি ভালো হবে, শরীরে ফুর্তি আসবে, পড়াশোনায় মন বসবে। শরীর সতেজ হয়ে উঠবে এবং সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করতে পারব।

৪. ঘুমের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে লিখ।

বিকালে খেলাধুলা শেষে ঘরে ফিরব এবং পড়াশোনা শেষে রাতের খাবার খেয়ে বিশ্রাম নেবো। সময়মতো ঘুমাতে যাবো। ঘুম হচ্ছে বিশ্রামের অন্যতম অংশ। একটি শিশুর প্রতিদিন কমপক্ষে ৯ থেকে ১০ ঘণ্টা ঘুমানোর প্রয়োজন হয়। বয়স অনুসারে ঘুমের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। যেমন-

১। ৫-৭ বছর বয়স পর্যন্ত ঘুমের পরিমাণ হবে ১০ থেকে ১১ ঘন্টা।

২। ৮-১১ বছর বয়স পর্যন্ত ঘুমের পরিমাণ হবে ৯ থেকে ১০ ঘন্টা।

৩। ১২-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ঘুমের পরিমাণ হতে পারে ৮ থেকে ৯ ঘন্টা।

৪। ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে হলে হবে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা।

উপরিউক্ত চার্ট অনুযায়ী ঘুমাতে যাওয়া ও ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এতে আমরা আমাদের শরীরে প্রতি যত্নবান হবো এবং পরিবারে, সমাজে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারবো।

৪. বাগান করার উপকারিতা বর্ণনা কর।

উত্তর: শিশুদের জন্য বাগান করা একটি আনন্দদায়ক ও শিক্ষামূলক কাজ। এতে আমরা প্রকৃতির কাছাকাছি যেতে পারি। বাগান করার মাধ্যমে আমরা যেসব উপকার পেয়ে থাকি:

-বাগান করার মাধ্যমে আমাদের শারীরিক ব্যায়াম হয়। মাটি খোঁড়া, পানি দেওয়া, গাছ লাগানো–এসব কাজ করতে গিয়ে শারীরিক পরিশ্রম হয়। ফলে শরীর সুস্থ ও সবল হয়।

-বাগান করার মাধ্যমে আমরা দায়িত্বশীল হতে শিখি। গাছের যত্ন নিতে হয় নিয়মিত। পানি দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার করা–এসব কাজ করতে গিয়ে আমরা দায়িত্ব পালন শিখতে পারি।

-বাগান করা আমাদের ধৈর্যশীল করে তোলে। একটি গাছ বড় হতে সময় লাগে। ফুল বা ফল পেতে অপেক্ষা করতে হয়। এতে ধৈর্য ধরে পরিশ্রম করা শিখতে পারি। আবার যখন ফুল বা ফল হয় তখন খুব আনন্দিত হই।

-এছাড়া বাগান করার মাধ্যমে আমাদের পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান বাড়ে। গাছের উপকারিতা, পাখি ও পোকামাকড় সম্পর্কে জানতে পারি। এতে আমাদের প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা জন্মায়।

বাগান করার মাধ্যমে আমরা আনন্দ পাই। নিজের হাতে লাগানো গাছ বড় হতে দেখলে আমরা খুশি হই। তাই আমাদের উচিত বাগান করতে উৎসাহী হওয়া, বাগান করা এবং বাগানের যত্ন নেওয়া।

৫. দৈনন্দিন জীবনে নিরাপদ পানি কেন ব্যবহার করতে হয়? পানি নিরাপদ করার উপায় লিখ।

উত্তর: দৈনন্দিন জীবনে পানির ব্যবহার বহুবিধ। আমরা পানি পান করি, গোসল ও ধোয়ামোছার কাজে ব্যবহার করি। এই পানি বৃষ্টি, ঝরনা, নদী-নালা, খাল-বিল, ডোবা-পুকুর প্রভৃতি উৎস থেকে পাই। গ্রাম অঞ্চলের লোকেরা সাধারণত এ সকল উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করে। শহরে পানির প্রধান উৎস ট্যাপ বা কল। শহর কর্তৃপক্ষ নদী বা ভূগর্ভ থেকে পানি সংগ্রহ করে। শোধণকৃত পানি পাইপের সাহায্যে সরবরাহ করে থাকে। পানির অপর নাম জীবন। কাজেই সব সময় নিরাপদ পানি পান করতে হবে। কেননা নিরাপদ পানির অভাবে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

পানি নিরাপদ করার উপায়:

ক. আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েলের পানি সবচেয়ে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ। টিউবওয়েলের পানিতে সাধারণত কোনো রোগজীবাণু থাকে না।

খ. খাল-বিল বা নদীর পানি ভালোভাবে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে নিরাপদ পানযোগ্য করা যায়।

গ. হ্যালোজেন ট্যাবলেট ও ফিটকিরি দিয়ে পানি শোধন করে তা পানযোগ্য করা যায়।

ঘ. ফিল্টার বা সিদ্ধ করা পানি পান করা নিরাপদ।

৬. পানি কীভাবে দূষিত হয়? দূষিত পানি ব্যবহার করা যাবেনা কেন? বুঝিয়ে লিখ।

উত্তর: খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হলে জমিতে পানি সেচ ও রাসায়নিক সার দিতে হয়। খেতের পোকামাকড় দমনের জন্য বিভিন্ন রকম কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। এ ওষুধের কিছু অংশ বৃষ্টির পানি দূষিত করে। এর ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মরে যায়। পুকুরের পানিতে গরু, মহিষ, ছাগল গোসল করালেও পানি দূষিত হয়। জলাশয়, কূপ কিংবা নলকূপের আশপাশে মল ত্যাগ করলে পানি দূষিত হতে পারে। কূপের গা চুইয়ে বাইরের ময়লা পানি কূপের মধ্যে ঢুকে পানি দূষিত করতে পারে। খাদ্যের উচ্ছিষ্ট, ময়লা-আবর্জনা, জীবজন্তর মৃতদেহ, গৃহস্থালির ব্যবহার্য নানা ধরনের পচনশীল জিনিস পচে বিভিন্ন প্রকার রোগজীবাণু সৃষ্টি করে। এ সমস্ত রোগজীবাণু বৃষ্টির পানি, বাতাস, অন্যান্য জীবজন্তুর মাধ্যমে বাহিত হয়। সবশেষে নদী-নালা, ডোবা-পুকুর, খাল-বিল এবং কলের পানিকেও দূষিত করে। এই দূষিত পানি পান করলে মানুষ কলেরা, উদরাময়, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশের বিভিন্ন শিল্প যেমন- কাপড়কল, পাটকল, কাগজকল, রাসায়নিক কারখানা, সার কারখানা, চামড়া প্রক্রিয়াজাত কারখানাগুলো সাধারণত নদীর ধারেই অবস্থিত। এ সকল কারখানার বর্জ্য পদার্থ নদী নালার পানি দূষিত করে। এই দূষিত পানি ব্যবহারে আমাদের চর্মরোগ হয়। আমরা দৈনন্দিন কাজে দূষিত পানি ব্যবহার করবনা।

৭. পানিবাহিত রোগ কাকে বলে? কলেরা রোগের লক্ষণ উল্লেখ কর।

উত্তর: যেসব রোগজীবাণু পানির মাধ্যমে ছড়ায়, সেসব রোগকে পানিবাহিত রোগ বলে। যেমন- কলেরা, ডায়রিয়া ইত্যাদি।

ভিব্রিওকলেরি নামক এক প্রকার জীবাণু দ্বারা কলেরা সংক্রামিত হয়। পানিবাহিত রোগের মধ্যে কলেরা অত্যন্ত মারাত্মক।

লক্ষণ: জীবাণু উদরে প্রবেশের কয়েক ঘন্টার মধ্যে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। চাল ধোয়া পানির মতো পায়খানা ও বমি হতে থাকে। হাতে-পায়ে খিল ধরে ও খিঁচুনি দেখা দেয়। শরীর পানিশূন্য হয়ে পড়ে। প্রস্রাব কমে যায়। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. ডায়রিয়া রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার লিখ। ডায়রিয়া রোগের চিকিৎসায় খাবার স্যালাইন বানানোর নিয়ম বর্ণনা কর।

উত্তর: ডায়রিয়া: ডায়রিয়া বাংলাদেশের একটি অন্যতম পানিবাহিত রোগ। এ রোগের আক্রমণে প্রতিবছর অনেক মানুষ মারা যায়। বিশেষ করে এ রোগে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার খুব বেশি। ডায়রিয়া হলে রোগীর দেহ থেকে পানি ও লবণ বেরিয়ে যায়। ফলে দেহের পানি কমে যায়। রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে। ঠিকমতো চিকিৎসা করা না হলে রোগী মারাও যেতে পারে।

লক্ষণ: ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হয়; বারবার বমি হয়; খুব পিপাসা লাগে; মুখ ও জিহ্বা শুকিয়ে যায়; চোখ বসে যায়; কাঁদলে শিশুর মাথার চাঁদি বা তালু বসে যায়; আস্তে আস্তে রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

প্রতিকার: ডায়রিয়া রোগের লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথেই রোগীকে খাবার স্যালাইন খাওয়ানো শুরু করতে হবে। স্যালাইন খাওয়ানোর পাশাপাশি রোগীকে তার উপযোগী স্বাভাবিক খাবার দিতে হবে। স্যালাইন খাওয়ানোর পরও পায়খানা না কমলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। আজকাল বাজারে খাওয়ার স্যালাইন কিনতে পাওয়া যায়। প্যাকেটের গায়ে এই স্যালাইন বানানোর নিয়ম লেখা থাকে। তাছাড়া বাড়িতেও খাওয়ার স্যালাইন বানানো যায়।

খাওয়ার স্যালাইন বানানোর নিয়ম: একটি পাত্রে আধা লিটার পরিমাণ ফোটানো ঠান্ডা পানি অথবা নিরাপদ নলকূপের পানি নিতে হবে। পরিষ্কার হাতে এক মুঠো গুড় বা চিনি এবং তিন আঙুলের ডগা দিয়ে এক চিমটি লবণ ঐ পানিতে মিশিয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে হবে। তাহলেই খাওয়ার স্যালাইন তৈরি হয়ে গেল। এই স্যালাইন অল্প অল্প করে বারবার রোগীকে খাওয়াতে হবে। একবার স্যালাইন তৈরি করে বার ঘন্টার বেশি খাওয়ানো যাবে না।

৯. সংক্রামক রোগ কাকে বলে? বসন্ত রোগ ও এর প্রতিকার সম্পর্কে লিখ।

উত্তর: সংক্রামক রোগ: যে সব রোগ তার বাহকের মাধ্যমে একজনের দেহ থেকে অন্যজনের দেহে পরিবাহিত হয় তাদের সংক্রামক রোগ বলে। সংক্রামক রোগসমূহকে ছোঁয়াচে রোগও বলা হয়। যেমন- বসন্ত, হাম, চর্মরোগ, খোস-পাঁচড়া ইত্যাদি।

বসন্ত: বসন্ত এক প্রকার সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগ। বসন্ত দুই প্রকার। ক. গুটিবসন্ত, খ. জলবসন্ত।

ক. গুটিবসন্ত: এমন একসময় ছিল যখন মানুষ গুটিবসন্তকে অত্যন্ত ভয় পেত। এ রোগটি অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করে। অতীতে প্রতিবছর বহুলোক এ রোগে মারা যেত। বর্তমানে গুটিবসন্তের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার হওয়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সরকারের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ থেকে এ রোগ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

খ. জলবসন্ত: গুটিবসন্তের মতো জলবসন্তও একটি সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগ। গুটিবসন্তের মতো মারাত্মক না হলেও জলবসন্ত কষ্টদায়ক একটি রোগ। কিন্তু এতে মৃত্যুর ঝুঁকি নেই। এক ধরনের ভাইরাস (ভেরিসেলা জোসটার) এ রোগ সৃষ্টি করে। সামান্য সর্দি-জ্বর হয়। সারা দেহে বেদনা ও পরে গুটি দেখা দেয়। গুটি প্রথমে

বুকে ও পিঠে বের হয়। ক্রমান্বয়ে হাতে-পায়ে ও মুখ-মন্ডলে বিস্তার লাভ করে। গুটিগুলো নরম ও এর ভিতর পানির ন্যায় তরল পদার্থ থাকে। অস্থিরতা ও গায়ে চুলকানি দেখা দেয়।

প্রতিকার: নখ দিয়ে গুটি চুলকানো উচিত নয়। নিমপাতা সিদ্ধ পানি দিয়ে সারা শরীর মুছে দিলে রোগী আরাম বোধ করে। এ অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীর চিকিৎসা করাতে হবে।

প্রতিরোধ: রোগীকে আলাদা ঘরে রাখতে হবে। রোগীর ব্যবহার করা থালাবাসন, বিছানাপত্র অন্য কেউ ব্যবহার করবে না। বিছানাপত্র সোডামিশ্রিত পানি দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। রোগী সুস্থ হওয়ার পরও দুই-তিন সপ্তাহ বাইরে যাওয়া উচিত নয়।

১০. হাম রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার লিখ।

উত্তর: হাম: সিজেলস ভাইরাস দ্বারা এই রোগ সৃষ্টি হয়। হামে আক্রান্ত শিশুর হাঁচি-কাশি থেকে এই রোগের জীবাণু বাতাসের মাধ্যমে সুস্থ শিশুর দেহে প্রবেশ করে এবং হাম রোগ সৃষ্টি করে। হামে আক্রান্ত শিশুর সংস্পর্শে এলেও এই রোগ হতে পারে।

লক্ষণ: জ্বর, সর্দি-কাশি, চোখ লাল হয়ে যায় এবং পানিতে টলমল করে। মুখের ভেতরে দানা দেখা দেয় ও কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়। সারা শরীরে লালচে দাগ দেখা দেয়। দানা কালচে হয়ে একসময় খুসকির মতো হয়ে ঝরে যায়।

প্রতিরোধ: রোগীকে আলাদা করে রাখতে হবে। আক্রান্ত রোগীকে পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। শিশুর বয়স নয় মাস পূর্ণ হলে এক ডোজ হামের টিকা দিয়ে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা যায়। ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১. চর্মরোগের লক্ষণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে লিখ।

উত্তর: চর্মরোগ: চামড়া দ্বারা আমাদের শরীর আবৃত। সব সময় বাইরের ধুলাবালি, ময়লা প্রভৃতি লেগে লোমকূপের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ দেখা দেয়।

খোস-পাঁচড়া: স্কেবিস নামক পরজীবী জীবাণু দ্বারা এ রোগ সংক্রমিত হয়। এটি একটি ছোঁয়াচে রোগও বটে। রোগীর সংস্পর্শে এই রোগ বিস্তার লাভ করে।

লক্ষণ: প্রথমে আঙুলের ফাঁকে, কোমর, কুঁচকিতে দেখা দেয়। ধীরে ধীরে পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। পরজীবী কীট যেসব জায়গায় লুকিয়ে থাকে, সেখানে ফুসকুড়ি দেখা দেয় ও পেকে যায়। ক্ষতের সৃষ্টি হয়। চুলকানি খুবই তীব্র হয় এবং রাতে ঘুমানো যায় না।

প্রতিরোধ: রোগীকে আলাদা করে রাখতে হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। নিয়মিত গোসল করা ও গরম পানি দিয়ে ক্ষতস্থান ধুতে হবে। রোগীর ব্যবহার্য দ্রব্যাদি অন্য কেউ ব্যবহার করবে না। ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

১২. ব্যায়াম ও খেলাধুলায় দুর্ঘটনার এড়ানোর জন্য কী কী সতর্ক অবলম্বন করতে হবে সেগুলো লিখ।

উত্তর: খেলাধুলা ও ব্যায়াম করার সময় মাঝে মাঝে ব্যাথা পাওয়া, মচকে যাওয়া, মাসলপুল হওয়া- এ সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক। এ সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটলে জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। অনেক সময় চিকিৎসক পেতে দেরি হয়। সে জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা আবশ্যক হয়ে পড়ে। বিভিন্ন দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য নিম্নলিখিত সতর্ককতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

১. খেলাধুলা ও ব্যায়াম করার পূর্বে শরীরকে গরম (ওয়ার্ম-আপ) করতে হবে। ঠিকমতো শরীর গরম না করে খেলাধুলা শুরু করলে ছোট ছোট আঘাত ও মাংসপেশিতে টান ধরতে পারে।

২. কোনো স্থানে খেলাধুলা শুরু করার পূর্বে উক্ত স্থানটি ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে।

৩. অতিরিক্ত ব্যায়াম বা খেলাধুলা করা উচিত নয়। এতে উপকারের চেয়ে ক্ষতি হয় বেশি।

৪. সঙ্গীর সাথে ব্যায়াম করার সময় নিজের ওজন ও উচ্চতা অনুযায়ী সঙ্গী বেছে নিতে হবে।

৫. পিচ্ছিল, ভেজা ও ইটপাটকেলযুক্ত মাঠে খেলাধুলা করা উচিত নয়। এতে আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা থাকে বেশি।

৬. দা, কাস্তে, ছুরি, ব্লেড বা ধারালো কোনো বস্তু দ্বারা খেলাধুলা করা উচিত নয়।

৭. দিয়াশলাই, আগুন ও পটকাজাতীয় জিনিস দিয়ে খেলা করা উচিত নয়।

৮. বৈদ্যুতিক খুঁটির ধারে খেলাধুলা করা ঠিক নয়।

ব্যাবহারিক: ১। ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ২। ফুটবল ৩। ক্রিকেট।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা
পঞ্চম শ্রেণি
অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৬

পাঠ্যসূচি:

পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য, সুস্থতা অর্জনে পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য, মানসিক সুস্থতার জন্য পরিমিত ঘুম ও বিশ্রাম, বাগান করা, বিভিন্ন সংক্রামক রোগ, সংক্রামক রোগ সম্পর্কে সচেতনতা ও প্রতিরোধ, খেলাধুলায় ওয়ার্মআপ ও ব্যায়ামের উপকারিতা, ফুটবল খেলার নিয়ম, ক্রিকেট খেলা, ক্রিকেট খেলার কলাকৌশল।

প্রশ্নের ধারা ও মানবন্টন

লিখিত পরীক্ষা -৩০ (শিক্ষক সহায়িকার আলোকে বিষয় শিক্ষক শ্রেণি কক্ষে প্রশ্নের নমুনা এবং উত্তর উপস্থাপন করবেন।) ১০ টি প্রশ্ন থাকবে ৬ টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটির মান সমান।
লিখিত পরীক্ষার সময়- ১ ঘন্টা।
ব্যাবহারিক-২০
মোট-৫০

বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৬

পাঠ্যসূচি:

কাবাডি খেলার নিয়ম, কাবাডি খেলার কৌশল, ব্যাডমিন্টন খেলা, বিভিন্ন ধরনের দৌড়, লাফ ও নিক্ষেপ, মুক্ত সাঁতার চিত সাঁতার বুক সাঁতার ও প্রজাপতি সাঁতার, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, স্বাস্থ্যকার্ড প্রস্তুত, স্বাস্থ্য কার্ড পূরণ , বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ, লিঙ্গ সমতা, আবেগ-অনুভূতি ব্যবস্থাপনা ও উত্তম আচরণ, সহযোগিতা একটি মহৎ গুণ ,সহমর্মিতা ও সহযোগিতা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও প্রতিকার, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রাথমিক চিকিৎসায় অন্য ব্যক্তি বা সংস্থার সহায়তা, মন্দ স্পর্শের ঘটনায় ব্যক্তি বা সংস্থার সহায়তা ও মন্দ স্পর্শের প্রতিবাদ,দৈনিক সমাবেশ, নেতৃত্বদানের গুণাবলি ও ক্লাস ক্যাপ্টেন, বিজয় দিবস দেশ প্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতীয় দিবস উদযাপন, কাব স্কাউটিং, দুযোগ মোকাবিলায় করণীয় ও দুর্যোগ মোকাবিলায় স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব।

প্রশ্নের ধারা ও মানবন্টন

লিখিত পরীক্ষা -৩০ (শিক্ষক সহায়িকার আলোকে বিষয় শিক্ষক শ্রেণি কক্ষে প্রশ্নের নমুনা এবং উত্তর উপস্থাপন করবেন।) ১০ টি প্রশ্ন থাকবে ৬ টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটির মান সমান।
লিখিত পরীক্ষার সময়- ১ ঘন্টা।
ব্যাবহারিক-২০
মোট-৫০